সীমান্ত সমস্যা এখন সীমান্ত ছাড়িয়ে

হাসান মূর্তাজা

১৬ এপ্রিল। বিকাল ৫টা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্ত। আকস্মিকভাবে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কয়েকজন। সাদা পোশাকে। সঙ্গে কিছুসংখ্যক ভারতীয় দুষ্কৃতকারী। অপহরণের চেষ্টা করে দু'জন বাংলাদেশীকে। বাধা দেয় এলাকাবাসী। এলোপাতাড়ি গুলি চালায় সশস্ত্র বিএসএফ সদস্যরা। মারা পড়ে ১০ বছর বয়সী এক বাংলাদেশী শিশু। বিডিআর আসে। শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী। সীমান্তের ওপার থেকে বিএসএফ ব্যবহার করে মর্টার। বাংলাদেশের ৩০০ গজ অভ্যন্তরে মারা পড়ে এক অনুপ্রবেশকারী। আহত হয় আরেকজন। পাওয়া যায় বিএসএফের ব্যবহৃত ১টি রাইফেল, ১৫০ রাউন্ড তাজা গুলি, একটি ওয়ারলেস সেট। পরে জানা যায়, নিহত ব্যক্তি জীবন কুমার, বিএসএফের কমান্ড্যান্ট। আহত ব্যক্তি বিএসএফ জওয়ান সুরেন্দ্রন। উল্লেখ্য, সীমান্ত সংঘর্ষ চলাকালীন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিডিআর-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের শীর্ষ বৈঠক।

১৯ এপ্রিল। ছাগলনাইয়ার চম্পকনগর সীমান্ত এলাকায় সকালে ঘাস তুলতে যায় চম্পা নামে এক মহিলা। দুই বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে তাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। মহিলার আর্তচিৎকারে এগিয়ে আসে গ্রামবাসী। চম্পাকে ছেড়ে পালিয়ে যায় বিএসএফ জওয়ানদ্বয়।

২৩ এপ্রিল। ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের যাদবপুর সীমান্ত। ভোর ৫টার দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোপালপুর পশ্চিম মাঠের ক্ষেতে যান কৃষক বাবুল আক্তার ও জাইদুল। অকস্মাৎ বিএসএফ বাংলাদেশে প্রবেশ করে দুজনকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর হত্যা তাদের করা হয় । বিডিআর প্রতিবাদ জানিয়ে লাশ হস্তান্তরের জন্য বিএসএফকে চিঠি দেয়। কোনো জবাব দেয়নি বিএসএফ। একদিন পর লাশ দুটো ফেরত আসে। শরীরে বেয়নেটের আঘাতের অসংখ্য চিহ্ন। প্রত্যক্ষদর্শীরা স্তম্ভিত হয় নিরস্ত্র মানুষকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যার এই ঘটনায়।

২৪ এপ্রিল। ঠাকুরগাঁও জেলার বুজরুক সীমান্ত। রাত ৯টার দিকে স্থানীয় গরু ব্যবসায়ী আশরাফুল আলম সীমান্তে নো ম্যানস ল্যান্ডে যাওয়া মাত্র গুলি চালিয়ে হত্যা করে বিএসএফ। তারপর লাশ টেনে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতীয় ভূখন্ডে।

২৫ এপ্রিল। বেলা সাড়ে ১১টা। লালমনিরহাটের বুড়িরহাট সীমান্ত। যুবক উত্তম কুমার তার ক্ষেতে যায়। ওপার থেকে ডাক দেয় বিএসএফ জওয়ানরা। সরল বিশ্বাসে কাছে যায় উত্তম। কুচবিহার জেলার সাউথ চামটা ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যদের গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় উত্তমের হৃৎপিন্ড।

'প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কে'র কথা কূটনৈতিক মহলে বহুল আলোচিত প্রসঙ্গের একটি। ভৌগোলিকভাবে পাশাপাশি দুটো দেশের সম্পর্কের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত, ব্যাখ্যা দিয়ে তা বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। 'প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক' বললেই আমরা হৃদ্যতাপূর্ণ, শান্তিপ্রিয় সম্পর্ক বুঝে নেই। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ-ভারত প্রতিবেশী। উপরে যেসব ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে তার থেকে এই দুই প্রতিবেশীর মধ্যকার সম্পর্ক আঁচ করা যায়। একে কি 'প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক' বলা চলে?

আরো কিছু পরিসংখ্যান দেয়া যাক। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪ হাজার ২০০ কিলোমিটার। এই দীর্ঘ সীমান্তবর্তী এলাকায় গত পাঁচ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী ও দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হয়েছে ৩৮৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক। আহত হয়েছে ৪৭১ জন। গ্রেপ্তার ৪৯৬ জন। অপহৃত ৪৩ জন। এর মধ্যে শিশু ৮ জন। ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৬ জন নারী। এ বছর প্রথম চার মাসে (২২ এপ্রিল পর্যন্ত) বিএসএফের হাতে মারা পড়ে ৩০ জন বাংলাদেশী। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রামে হামলা, ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, ফসল উৎপাদন ও বাঁধ নির্মাণে বাধাদানসহ আরো হাজারো অপকর্ম করছে 'প্রতিবেশী' দেশটির সীমান্তরক্ষীরা। বলা হয় ভারত বাংলাদেশের 'পরীক্ষিত বন্ধু'। সেই 'পরীক্ষিত বন্ধু' কি সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে? নির্দ্বিধায় বলা যায়- না।

দুটো প্রতিবেশী দেশ, যাদের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, নানাবিধ সীমান্ত সমস্যা মোকাবেলা করে থাকে। এ ধরনের সমস্যা স্বাভাবিক। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এ কথা মেনে নিয়েছেন। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনার টেবিলে বসাটাও স্বাভাবিক নিয়মের অংশ। কিন্তু যখন দেখা যায়, আলোচনার টেবিলে কোনো এক পক্ষের আগ্রহ নেই, তখন বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে, সেই আলোচনাবিমুখ পক্ষই পরিকল্পনা মাফিক সমস্যা তৈরি করছে।

ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার করে বলা যাক। এপ্রিলের ১৩-১৬ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো বিডিআর-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক। দু'দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন বিএসএফ মহাপরিচালক রণজিত শেখর মুশাহারি। অতীত অভিজ্ঞতা বলে, এ ধরনের শীর্ষ বৈঠক সীমান্ত সমস্যা

নিরসনে তেমন কোনো অগ্রগতি আনতে পারেনি। গত বছর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লিতে বিডিআর-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠকের পর ছয় মাসে বিএসএফ ২৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। তারপরও মানুষ আশাবাদী ছিল এবারের বৈঠক নিয়ে। কিন্তু ঢাকায় নেমেই মুশাহারি বললেন, 'বিএসএফ কোনো নিরীহ মানুষ হত্যা করেনি।' সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া প্রসঙ্গে বললেন, 'ওই কাঁটাতার ভালো প্রতিবেশী তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।' এসব মন্তব্যের পর সবাই বুঝে যায় আলোচনা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। হয়েছেও ঠিক তাই। আলোচনার শেষ দিন, ভারতীয় পক্ষ 'খেলবো না' ধরনের ঠোঁটফোলানো মনোভাব দেখিয়ে একটি ফলনহীন বৈঠক উপহার দেয়। আলোচনা শুরুর দিন বিএসএফ সিদ্ধান্ত দেয়, বেড়া নির্মাণের বিতর্ক কূটনৈতিক চ্যানেলে সমাধান করা হবে। শেষ দিন জানায়, ব্যাপারটি যেমন চলছে, তেমনি চলবে। অর্থাৎ কূটনীতি নয়, ব্যাপারটি শেষতক বন্দুকের নলের মুখেই নিষ্পত্তি হবে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যা নিরসনে ১৯৭৪ সালের ১৬ মে স্বাক্ষরিত হয় মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি। চুক্তির ৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চুক্তিটি দু'দেশের সরকার অনুমোদন করবে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অনুমোদন দেয়া হলেও ভারতীয় পার্লামেন্ট আজ পর্যন্ত তা অনুমোদন করেনি। এছাড়া দু'দেশের সীমান্ত সঙ্কট এড়াতে ১৯৭৫ সালের একটি গাইডলাইন আছে। যা দু'দেশের সীমান্তরক্ষীরা অনুসরণ করে। গাইডলাইনের ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সীমান্ত রেখার উভয় দিকে ৩০০ গজের মধ্যে (উভয় দিকে ১৫০ গজ) কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না, কিন্তু বিএসএফ এই গাইডলাইন অমান্য করে ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া, সড়ক, সেতু ও ক্যাম্প নির্মাণ অব্যাহত রেখেছে। বাংকার খনন ও ভারী অস্ত্র মোতায়েন করছে। এ ধরনের চুক্তি লঙ্ঘন ও আগ্রাসী আচরণ ভালো প্রতিবেশী সুলভ নয়। তারপরেও ভারত এ ধরনের আচরণ করে চলেছে। অন্যদিকে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল হওয়ায় বাংলাদেশ 'কিল খেয়ে কিল হজম করছে' নীরবে।

এমন বৈরী সম্পর্ক কারো কাম্য হতে পারে না। দুঃখের বিষয়, পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় কমিটি বলতে বাধ্য হয়েছে, বর্তমানে দু'দেশের সম্পর্ক সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে শীতল। অথচ, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সীমান্ত বিভাজনের অনেক আগে থেকে। দু'দেশের সাধারণ জনতার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, আত্মীয়তার সম্পর্কে সীমানার বিভাজন বাধা হতে পারেনি কখনো।

'ভারতের আচরণ বাংলাদেশীদের আরও ভারতবিদ্বেষী করে তুলবে'

ড. ইমতিয়াজ আহমেদ

অধ্যাপক, AvšRwZK m¤úK wefvM, XvKv wekwe`¨vjq

সাপ্তাহিক ২০০০ : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ভারত দু'দেশের সম্পর্ক যথেষ্ট শীতল। দু'পক্ষের মধ্যে এক ধরনের কম্যুনিকেশন গ্যাপ বা কূটনৈতিক স্থবিরতা চলছে। এই মুহূর্তে দু'দেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি?

ড. ইমতিয়াজ আহমেদ: ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে সব সময়ই একটা উত্থান-পতন ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা সম্ভবত খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এর জন্য আপাত দৃষ্টিতে দুটো কারণকে দায়ী করা যেতে পারে। প্রথম কারণটি হচ্ছে ভারতের কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ডেডলাইন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। যেটা শেষ হবে ২০০৭-এর মার্চে। ভারত ইতিমধ্যে বাংলাদেশের দিক থেকে বাধাবিঘ্ন ছাড়াই অপেক্ষাকৃত ঝামেলা মুক্ত এলাকায় বেড়া তৈরির কাজ শেষ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের যে এলাকাগুলোতে জলাভূমি, নদী কিংবা আঁকাবাঁকা রাস্তা রয়েছে, সেখানে বেড়া তৈরি করা এতটা সহজ নয়। এছাড়াও এখানে কিছু গ্রাম রয়েছে যেগুলোর ওপর ভারত-বাংলাদেশ দু দেশেরই দাবি রয়েছে। তাই ভারত যখনই আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে বেড়া দেওয়া শুরু করবে, তখনই মূল সমস্যা শুরু হবে। কোনো দেশ তাদের সীমানার ১৫০ গজ বা ১৩৮ মিটারের ভেতরে কোনো বেড়া বা অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবে না। বিডিআর এখন পর্যন্ত এই আন্তর্জাতিক সীমারেখা শর্তের ওপর কঠোর অবস্থান আছে। পরের কারণটি হচ্ছে, দু'পক্ষের সীমান্তরক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ। ঢাকা বা দিল্লির কোনো সরকারি নির্দেশ ছাড়াই বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে, গোলযোগের কারণগুলো শুধু স্থানীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট। এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ঘটনা এড়ানোর জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে একটা চলমান সংলাপের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

২০০০ : ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে এবং জনসাধারণের ওপর আক্রমণ চালায়। তাদের এ ধরনের আচরণ বন্ধ করতে বাংলাদেশ কি করতে পারে?

ড. ইমতিয়াজ : ভারতীয়দের বোঝা উচিত ধরনের আচরণ বাংলাদেশীদের আরও ভারতবিদ্বেষী করে তুলবে। বিষয়টা হয়তো দু'দেশের জঙ্গি গ্রুপগুলোর জন্য লাভজনক হতে পারে। কিন্তু 'সাধারণ জনগণের' স্বার্থ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে যাবে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ যা করতে পারে তা হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, মিত্রতাপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি এবং ক্রমন্নত প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার ফলে ভারতীয়রা বাধ্য হবে তাদের সরকারের ওপর জোরালো চাপ সৃষ্টি করতে। যাতে করে বাংলাদেশবিরোধী কোনো পদক্ষেপ না নেয়। আমার মনে হয়, ভারতে বাংলাদেশ লবি খুবই দুর্বল এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরের। আমাদের কূটনীতি এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের খুব সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে হবে কিভাবে আমরা ভারতের সঙ্গে আচরণ করব। কারণ বিশ্বায়ন এখন আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সব ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতির চিরাচরিত সংজ্ঞা পাল্টে দিয়েছে।

২০০০ : ইদানীং ভারত পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অথচ বাংলাদেশের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সার্ক স্থগিত হলো ভারতের কারণে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের টানাপড়েনের জন্য দিল্লির দাদাগিরি দায়ী- এমনটাই অনেকের অভিমত। আপনি কি মনে করেন?

বোঝা যায়, দু'দেশের বর্তমান সম্পর্কে যে নাটকীয় অবনতি, তার সিংহভাগ দায় ঢাকা-দিল্লির রাজনৈতিক মহলের।

এক হাতে তালি বাজে না ঠিকই। আবার দুটো হাতই সমান নড়ে না। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অবনতির পেছনেও একই যুক্তি খাটে। ১৬ এপ্রিল ঘটনার কথা ধরা যাক। আগের দিন, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরা অবৈধ মুদ্রাসহ এক ভারতীয়কে আটক করেছিল। জানা যায়, সেই চোরাকারবারীকে ছাড়িয়ে আনতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইনের তোয়াক্কা না করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল বিএসএফ। শুধু প্রবেশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের ওপর হামলা চালিয়েছে, হত্যা করেছে শিশুকে। অথচ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের বাহিনীর আগ্রাসী তৎপরতার কথা স্বীকার তো করেইনি, উল্টো দোষ চাপিয়েছে বাংলাদেশের কাঁধে। ভারতীয় পক্ষ ঘটনার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা অসংখ্য স্ববিরোধীতায় পূর্ণ। বাংলাদেশের ৩০০ গজ অভ্যন্তরে কেন সাদা পোশাকে বিএসএফ সদস্যরা সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ করেছিল তার কোনো সদুত্তর তারা দিতে পারেনি। উপরন্তু, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার সর্বাজিৎ চক্রবর্তী বলেছেন, 'বিডিআরের গুলিতে একজন বিএসএফ রক্ষী নিহত হলো। বিএসএফ কি এতোই কাঁচা যে পাল্টা কিছু করলো না? আমরা সংযত ছিলাম। তাই পাল্টা কিছু ঘটেনি।' সর্বাজিৎ চক্রবর্তীর কথামতো বিএসএফ পরবর্তী সপ্তাহে 'সংযমের' চরম নজির দেখিয়ে ৫ জন সাধারণ বাংলাদেশীকে হত্যা করে এবং নোম্যান্স ল্যান্ডে বাংলাদেশীকে দেখামাত্র গুলির হুমকি দেয়।

অসংখ্যবার ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা আইন ভেঙে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। গত ছ'মাসে বিএসএফ প্রবেশ করেছে ১৫ বার; ভারতীয় বেসামরিক নাগরিকেরা ৫৮ বার। হত্যাকান্ডের খতিয়ান আগেই দেয়া হয়েছে। এসব হত্যাকান্ড ও সীমান্ত লংঘনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার বিধান থাকলেও বাংলাদেশ তা করেনি। বিডিআর সীমানা অতিক্রম করে গুলি চালিয়ে ভারতীয় নাগরিক হত্যা করেছে, এমন নজির নেই। অথচ ভারতীয় পক্ষের দাবি, সংযম দেখাচ্ছে তারা!

মুখে নয় বাস্তবে সংযম দেখানোর দায়িত্ব ভারতের। আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ভারতের কাছ থেকে সহনশীলতা শুধু বাংলাদেশ নয়, সব প্রতিবেশীর কাম্য। চীন কিংবা পাকিস্তানের মতো শক্তিমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে ভারত যতোটা ম্রিয়মাণ, বাংলাদেশ বা নেপালের মতো প্রতিবেশীর প্রতি ঠিক ততোটাই আগ্রাসী। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা

ড. ইমতিয়াজ : প্রতিবেশীদের প্রতি ভারতীয় কংগ্রেসের আচরণ সব সময়ই দাদা সুলভ। প্রতিবেশীদের প্রতি এ ধরনের কঠোর মনোভাবের পেছনে আমার মনে হয় দুটো কারণ। প্রথমত. কংগ্রেসের একদল শীর্ষস্থানীয় বয়স্ক নেতা, যারা সোনিয়া গান্ধী থাকা সত্ত্বেও এখনও সমান জনপ্রিয়। এই দলটি চেতনায় এখনও মাৎস্যন্যায় যুগকে লালন-পালন করছে। যেখানে বড় মাছের স্বাভাবিক অধিকার থাকে ছোট মাছকে গিলে খাবার। অবশ্য এই চিন্তাধারা কমবেশি ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রের মূল কাঠামোর অংশ হয়ে পড়েছে। এমনকি কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া (আই কে গুজরাল) সব রাজনৈতিক দলই এ চেতনায় বিশ্বাসী। দ্বিতীয় কংগ্রেস সব সময়েই ভারতীয় জনগণের সামনে এক ধরনের আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভোগে। ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে একটা সাধারণ জনশ্রুতি আছে, যে দল হিসেবে কংগ্রেস অনেক নমনীয়। এটা অবশ্য একই সঙ্গে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিকভাবে মনে করা হয়। এই আইডেনটিটি ক্রাইসিস কাটিয়ে ওঠার জন্য বিশেষ করে বিরোধী দলের কঠোর অবস্থানের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই কংগ্রেসকে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে যেতে হয়। তবে বাংলাদেশকে এখন পাকিস্তানের চেয়ে বেশি এই ব্যাপারটার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কারণ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দু'দিকেই চাপে থাকতে হচ্ছে। বাংলাদেশের সঙ্গে এই সমস্যা নেই। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের ব্যবহার তাই উদ্ধত । তাই বাংলাদেশ সরকারকে সবকিছুর আগে এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা ও সেই মতো কাজ করতে হবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ। বাংলাদেশ পূর্বমুখী কূটনীতিকে বর্তমানে প্রাধান্য দিচ্ছে। এতে লাভের সম্ভাবনা আছে কি?

ড. ইমতিয়াজ : বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে শ্রমিকের মজুরি অনেক বেশি এবং তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে মজুরির পরিমাণ অত্যধিক। এই দেশগুলোতে আজ উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বমুখী নীতি শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, এর সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক কারণও আছে। সেটা হলো বাংলাদেশ সব সময় দেখাতে চায় সে একা না। এতে বিশ্ব রাজনীতিতে কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ একটা দেশের ওপর নির্ভরশীল হতে চায় না। বাংলাদেশ আমেরিকার ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে চায়। ভারতের ওপর নির্ভরশীল হতেই চায় না। যদি পূর্বমুখী নীতি অবলম্বন করে তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। আর বিশ্বায়নই বাংলাদেশকে এ সুযোগ এনে দিয়েছে।

২০০০ : পূর্বমুখী নীতির ফলে কি অন্যদেশের সঙ্গে সম্পর্কের কোনো অবনতি হবে?

ড. ইমতিয়াজ : নির্ভরশীলতার অনেকগুলো স্তর আছে। সামরিক নির্ভরশীলতা থাকতে পারে; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত নির্ভরশীলতা থাকতে পারে। ইন্ট্যালেকচুয়াল দিক থেকে বাংলাদেশ প্রচন্ডভাবে পশ্চিমমুখী। অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমে গেছে। বর্তমানে ব্র্যাক আফগানিস্তান, আফ্রিকায় ভালো কাজ করছে। আফ্রিকায় গ্রামীণ কাজ করছে।

বিশ্বায়নের জন্যই আমেরিকা একচ্ছত্র আধিপত্য করতে পারবে না। এখানে চীন, জাপান, ইউরোপ আছে। বাংলাদেশের এখানে ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া বিশ্বায়নের কারণেই উন্নত দেশগুলোও বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এ কারণেই পূর্বমুখী নীতি অনুসরণ করলেও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হবে না।

২০০০ : কিছুদিন আগে দাতাগোষ্ঠী বাংলাদেশ ছাড়া মিটিং করলো এবং কন্ডোলিৎসা রাইস ভারতকে বলল বাংলাদেশের ওপর নজর রাখতে- এই দুটো বিষয় আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

ড. ইমতিয়াজ : কন্ডোলিৎসা রাইস হলেন কট্টরপন্থি মানসিকতার। তার মতে, মুসলমানদের সঙ্গে সন্ত্রাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি মনে করেন, ইসলামের সমর্থক প্রত্যেকেই সন্ত্রাসের সমর্থক। আসলে বিষয়টা তা নয়। কন্ডোলিৎসা রাইস 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর সে নীতি অনুসরণ করছেন তাকে এতো গুরুত্ব না দিলেও চলে। আবার একেবারে উপেক্ষাও করা যায় না। এখানে আমেরিকার একটা ভূমিকা আছে। যে তার অস্ত্র বিক্রির জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করছে। সে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য ইরাক আক্রমণ করছে। তাই বলা যায়, কন্ডোলিৎসা রাইসকে এই মুহূর্তে গুরুত্ব না দিলেও আমেরিকার ভূমিকার ব্যাপারে আমাদের সর্তক থাকা প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকার : **আসাদুর রহমান** ও **পারভীন তানি**
সহযোগিতায় : **কনিকা বিশ্বাস**

যেখানে প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য, ভারতের ক্ষেত্রে যেন ব্যাপারটি উল্টো। তা না হলে ভারত কেন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অমান্য করে সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ অব্যাহত রাখবে? বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুনর্ভবা নদীর প্রায় ২০ কিলোমিটার অংশ বিএসএফ দখল করে ঐ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও তীর সংরক্ষণ কাজে বাধা দেবে? ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের বাঁধার কারণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া নদী, ফেনীর মুহুরী নদী, খাগড়াছড়ির ফেনী নদী, সিলেটের সুরমা-কুশিয়ারা, নওগাঁর আত্রাই নদীর বন্যাপ্রবণ এলাকায় বাঁধ নির্মাণ স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের আপত্তি সত্ত্বেও টিপাই নদীমুখে নির্মাণ অব্যাহত রেখেছে ভারত। অন্যদিকে, দিল্লি ও মাদ্রাজ থেকে সংখ্যালঘু বাংলাভাষী মুসলমানদের ধরে এনে বাংলাদেশে 'পুশইন' করা হচ্ছে। দিল্লি হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, প্রতিমাসে ৩ হাজার বাংলাভাষীকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর। গত বছর এ পর্যন্ত মোট ৫১৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই এপ্রিল মাসেই বিএসএফ ৩০ জনেরও বেশি ভারতীয়কে এ দেশে পুশইন করেছে। 'পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া করার' এই প্রবণতা কি কোনো সৎ প্রতিবেশীর জন্য শোভা পায়?

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগের অন্ত নেই। দু'দেশের সীমান্তে সংঘর্ষের জন্য ভারত সবসময় বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীদের দুষেছে। তবে বড় অভিযোগটি হচ্ছে, বাংলাদেশ ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়। ভারতের দাবি বাংলাদেশে ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের ১৯৫টি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প রয়েছে। এছাড়া কথিত ভারতীয় বিদ্রোহী আছে ১২৬ জন। বাংলাদেশ বরাবরই ভারতের এই অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। ভারতীয়দের দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশ অংশে বিডিআর তল্লাশি চালিয়েছে। এমনকি বিএসএফকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে কথিত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে বিডিআরের তরফ থেকে। ভারত সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। তারচেয়ে বড় ব্যাপার, ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্যাম্পের সঠিক অবস্থান কখনোই উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করেনি বা করতে পারেনি।

পক্ষান্তরে বাংলাদেশ ভারতে আশ্রিত ৩৫৩ জন বাংলাদেশী সন্ত্রাসীর তালিকা, নাম-পরিচয় ও ছবিসহ হস্তান্তর করেছে। উপজাতি বিদ্রোহী তুলামণি চাকমা ত্রিপুরার গন্ডাছড়া পুলিশ স্টেশনে পুলিশ পরিদর্শক কিংবা সুভাষব্রত চাকমা আগরতলার রাধানগরে সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে কাজ করছে- এমন সঠিক এবং অনুপুঙ্খ তথ্য বাংলাদেশ ভারতের কাছে উপস্থাপন করেছে। এছাড়া, সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় ভূ-খন্ডে যেসব ফেনসিডিল কারখানা রয়েছে, সেগুলোর অবস্থান ও মালিকের তালিকাও বাংলাদেশ তুলে দিয়েছে দিল্লির হাতে। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের এসব অভিযোগের যথাযথ গুরুত্ব কখনোই দেয়নি।

দু'দেশের কূটনৈতিক চ্যানেলে ব্যর্থতাই মূলত সীমান্ত সমস্যাসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে। দু'দেশের বিরাজমান সমস্যার সমাধানের জন্য উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের ঘন ঘন আলোচনার টেবিলে বসার প্রয়োজন। অথচ কাজটি কখনোই নিয়মিত করা হয় না। হলেও মতৈক্যের চেয়ে মতানৈক্যই প্রতিষ্ঠা পায় বেশি। কাজেই দু'দেশের কূটনৈতিক মহলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। দু'দেশের রাজনীতিবিদদের বেফাঁস কিছু মন্তব্য পরস্পরকে আরো দূরে ঠেলে দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চীন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে ভারত পদক্ষেপ নিচ্ছে। 'ক্রিকেট ডিপ্লোমেসি'র বদৌলতে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ভারত ঘুরে গেলেন। দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবার সম্ভাবনা তৈরি হলো। এছাড়া ভারত সফর করলেন চীনা প্রধানমন্ত্রী ওয়ান জিয়াবাও। এই ঐতিহাসিক সফরে চীন সিকিমের ওপর ভারতীয় আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে দীর্ঘদিনের সীমান্ত সমস্যার একটা সমাধান টানে। প্রশ্ন হচ্ছে, ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটাতে দিল্লি আগ্রহী নয় কেন? কিংবা ঢাকা কেন দিল্লিকে আলোচনার জন্য সেভাবে চাপ দেয় না? সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে দু'পক্ষের উদ্যোগে যে ঘাটতি প্রকট সেটা বেশ বোঝা যায়। ভারতীয় পক্ষের অনাগ্রহও বেশ লক্ষণীয়।

ভারতীয় অনাগ্রহের একটি কারণ হতে পারে দাদাসুলভ উন্নাসিকতা। সামরিক, অর্থনৈতিক শক্তি এবং ইদানীং আমেরিকার পিঠ চাপড়ানোর কারণে ভারত নিজেকে দক্ষিণ এশিয়ার অভিভাবক ভাবতে শুরু করেছে। ছোট দেশগুলোকে 'পাত্তা' না দেয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের সেই মনোভাবের প্রকাশ ঘটছে। নেপালের অভ্যন্তরীণ কারণে সার্ক সম্মেলনে না আসা কিংবা মার্কিন অনুমতিসাপেক্ষে বাংলাদেশের 'দায়িত্ব' নিতে চাওয়ার মাধ্যমে ভারতের দাদাগিরির প্রকাশ সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে ভারতীয় মিডিয়া। 'বাংলাদেশ একটি উগ্র মৌলবাদী ও ব্যর্থ রাষ্ট্র' বহির্বিশ্বে ক্রমাগত এই প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল মিডিয়া। প্রশ্ন হচ্ছে, মিডিয়ার এই প্রচারণায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কৌশল কেন প্রভাবিত হচ্ছে? নাকি দিল্লির কূটনৈতিক মহল শুনতে চায় বলেই ভারতীয় মিডিয়া একই রেকর্ড বারবার বাজাচ্ছে? ছোট-বড় সবক্ষেত্রে ভারতীয় মিডিয়ার টার্গেট বাংলাদেশ। অথচ ১৬ এপ্রিল বিএসএফের গুলিতে যে বাংলাদেশী শিশুটি মারা গেল অকালে, এই খবর ভারতীয় 'দায়িত্বশীল' সংবাদপত্রগুলো পরিবেশন করেনি। উপরন্তু 'আনন্দবাজারের' মতো পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য দিল্লিশাহীকে প্ররোচনা দেয়া হয়।

এর ফলাফল ভারতের অনুকূলে যাচ্ছে না। বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে তীব্র ভারতবিরোধী মনোভাব। যা এক দশক আগেও ছিল না। নেপালেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। গোপনে মাওবাদীদের সহায়তা এবং প্রকাশ্যে রাজার বিরোধিতা করার ভারতীয় কৌশল নেপালবাসী ভালোভাবে নেয়নি। কাঠমান্ডুতে এখন ভারত বিরোধী তীব্র গণঅসন্তোষ। একই পরিস্থিতির দিকে এগুচ্ছে বাংলাদেশের সমাজ। ভারত বিরোধিতা আগামী নির্বাচনে যে একটি মূল ইস্যু হিসেবে দেখা দিবে তা আন্দাজ করা যায়। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আশাবাদী হবার মতো একটি দিকই সে ক্ষেত্রে অবশিষ্ট আছে। তা হলো দু'দেশের জনগণের আত্মীয়সুলভ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যদি একবার নষ্ট হয়, কূটনীতির হাজারো উদ্যোগে তা মেরামত করা সম্ভব হবে না। ঢাকা-দিল্লি উভয়েরই ব্যাপারটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং তা যত শীঘ্রই সম্ভব।

ভারতীয় অনাগ্রহের কারণ দাদাসুলভ উন্নাসিকতা। সামরিক, অর্থনৈতিক শক্তি এবং ইদানীং আমেরিকার পিঠ চাপড়ানোর কারণে ভারত নিজেকে দক্ষিণ এশিয়ার অভিভাবক ভাবতে শুরু করেছে। ছোট দেশগুলোকে 'পাত্তা' না দেয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের সেই মনোভাবের প্রকাশ ঘটছে